***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 312 – 321*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848*

# জগদীশ গুপ্ত : ব্যতিক্রমী শিল্পিত স্বভাব

শুভাশিষ ভঞ্জ
ইমেইল : subhasisbhanja1999@gmail.com

## Keyword
জগদীশ গুপ্ত, রাজনীতি, নিয়তিবাদ, বহুমাত্রিকতা, আধুনিকতা, যৌনপ্রবৃত্তি, বহুকৌণিক স্বর।

## Abstract
জগদীশ গুপ্ত ছিলেন স্বল্পপরিচিত সাহিত্যিক। তাঁর সমকালে অন্যান্য সাহিত্যিক যেমন তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মাণিক তিন বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য আরোও অনেক লেখকদের তুলনায় তার জনপ্রিয়তা কম। অথচ তিনি প্রচুর ছোট গল্প ও কবিতা লিখেছেন। উপন্যাসের সংখ্যা সে তুলনায় অল্প হলেও চোখে না পড়ার মতো নয়। কল্লোল ও কালিকলম পত্রিকা কে আশ্রয় করে যে নতুন ধরনের কথা সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা যায় তার একমাত্র সার্থক রূপকার জগদীশ গুপ্ত। সেই সময় কল্লোল যুগের লেখক এবং তিন বন্দ্যোপাধ্যায়— বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিকের জনপ্রিয়তার ছটায় তাঁকে, এমনকি ম্রিয়মাণ বললেও ভুল হবে, তিনি ছিলেন প্রায় লুপ্ত। যা তিনি লিখেছেন তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়, কল্লোল, কালি-কলম থেকে শুরু করে ভারতী, বঙ্গশ্রী, প্রবর্তক, হিন্দু, বিজলি, সোনার বাংলা, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি বহু বহু পত্রিকাতেই তিনি নিয়মিত লিখে এসেছেন। অথচ কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করা যায়, তৎকালীন পাঠক তাকে নিজেদের প্রিয় লেখক করে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী সাহিত্যিক, তাঁর লেখায় বাস্তবতা, আধুনিকতা, নিয়তিবাদ, আশাবাদ এক বিশিষ্ট দিক প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে ও সত্যের বাস্তব রূপায়ণ কে তিনি তার লেখাতে তুলে ধরেছেন। মানব জীবনের অন্ধকারময় সমাজ লেখাতে প্রতিফলিত। জগদীশ গুপ্ত অন্ধকার জগতের লেখক হিসেবে পরিচিত। বাস্তব ও সত্য তার লেখাতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দস্তয়েভস্কির Underground man বা বিমল কর যাকে বলেছেন জলের তলার মানুষ তাকে লক্ষ্যণীয়ভাবে আবিষ্কার করেছেন জগদীশ গুপ্ত। এটাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জগৎ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা কিছু প্রতিষ্ঠাত তাকে বিনা যাচাইয়ে গ্রহণে আপত্তি, প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থার অভাব, জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তীর্যক দৃষ্টি, কুটেষণা ও অন্তগূঢ় জটিলতা, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি যে কথা শিল্পীর আধুনিক দৃষ্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করে, এমন শিল্পী হলেন কল্লোল উত্তরকালের জগদীশ গুপ্ত। মানুষ তার সামাজিক জীবনে অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহারের যতোই মহৎ সাজার চেষ্টা করুক, ভেতরে ভেতরে সে যে পাশব সত্ত্বা লালন করে, সেই স্তর থেকে সে যে খুব বেশি উন্নত হতে পারেনি এই সত্যই জগদীশ গুপ্ত উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী স্বভাবের লেখক হয়ে উঠেছেন।

## Discussion

যে কোনো সাহিত্যই সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আর সাহিত্য যারা লেখেন তারা সমকালীন সমাজ কে কেন্দ্র করেই সাহিত্য রচনা করেন। তিনি কখনোই পারবেন না তার সমকালীন সমাজের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক রাজনৈতিক ঘটনাকে এড়িয়ে চলার। ঠিক এরকমই একজন সাহিত্যিক যিনি সমাজের সত্যতাকে চরম বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন ব্যতিক্রমী গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে। তিনি 'অনুপস্থিত' বা 'অন্তরালের সাহিত্যিক' বলে খ্যাত। তাই বোধহয় পরবর্তীকালে সুবীর রায়চৌধুরীকে সারস্বত, আষাঢ়, ১৩৭৫-এ 'লুপ্ত লেখক জগদীশ গুপ্ত লিখতে হয়েছিল। তবে 'বিচিত্রা' ভাদ্র ১৩৩৬ -এ অনিলবরন রায়ের 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ', মোহিতলাল মজুমদারের 'সাহিত্য বিতান' থেকে সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খন্ড) এবং পরে 'বাংলা উপন্যাসের কলান্তরে' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকৃতি এবং হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতা' : জগদীশ গুপ্ত এবং নানান পত্র-পত্রিকায় বিশেষত পরিচয় ২৭ বর্ষ ২-৩ সংখ্যায় অশোক গুহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কার্তিক-পৌষ, ১৩৮০ 'চারুবালা দেবীর জীবনকথা' এগুলি থেকে নানা তথ্য পাই। জগদীশ গুপ্ত কল্লোল-কালিকলমেয সময়েরই লেখক। কিন্তু তিনি বিপরীত স্রোতে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাই হাসান আজিজুল হক যথার্থই বলেছেন —

> "স্বীকার করতে হবে যে, কল্লোল ও কালিকলম পত্রিকা প্রচলিত সাহিত্যরুচিকেই আঘাত করতে ও বদলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, তাতে অগণিত সাধারণ পাঠকের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও সাহিত্যের পালাবদলের প্রক্রিয়াটা ঠিক চালু হয়ে যায়।"[১]

### জগদীশ গুপ্তের শিল্পীত স্বভাবের ব্যতীক্রমীতা —

ব্যতীক্রমী লেখক সব সাহিত্যেই থাকেন, তাঁকে সময়কালে উপলব্ধি করা এবং সময়ের সাজুজ্যে বিচার করা সহজসাধ্য নয়। তদুপরি কেবল জনচিত্তের চাহিদা মাথায় রাখা যাঁর ধাতে নেই, তাঁর পক্ষে সময়ের কিংবা উত্তরকালের পাঠকের কাছেও স্পৃহনীয় হওয়া কঠিন, ঠিক এরকমই ব্যতীক্রমী স্বভাব জগদীশ গুপ্তের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তার রচনা প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন —

> "ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে সংযোগ রক্ষা ও বিশ্বাস্যতার অভাবেই তিনি জনজয়ী হননি।"[২]

বরং নির্মম অথচ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মানব হৃদয়ের গোপনতম স্বরূপটি উদ্ঘাটনেই ছিল তার কাজ। তাঁর সমালোচকদের দু'একটি প্রতিনিধিমূলক মন্তব্য সামনে আনছি—

> "মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সামনের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃনা বা সুন্দরা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। তিনি কিছুকে বা কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ অদৃষ্টশক্তি মানুষের ভাগ লইয়া ছিনিমিনি খেলে, তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।"[৩]

সাহিত্যিক জগদীশ চন্দ্রের রচনায় বিনাশ আছে কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো রচনা ট্র্যাজেডি হয় সেটাই অনুপস্থিত। তাঁর কোনো চরিত্রই মহৎ বা মর্যাদাসম্পন্ন নয়, এবং রচনার শেষতম প্রাপ্তিও Katharsis এর মতো উন্নত-গম্ভীর উপলব্ধিতে নিয়ে যায় না পাঠককে। অদৃষ্টের উপস্থিতি তাঁর কোনো রচনায় নেই কেবল 'দিবসের শেষে'র মতো ব্যতীক্রমী জাতীয় গল্পে কামদা নদীতে কুমিরের মধ্যে তার চকিত আভাস মেলে এ ব্যাপারে গ্রীক অদৃষ্ট, ভারতীয় ভাগ্য, শেক্সপিয়ারের নিয়তি বা হার্ডির প্রকৃতি কারুর সঙ্গেই জগদীশ গুপ্তের তুলনা হয় না। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হয়েও তিনি কল্লোলের মজলিসে উপস্থিত থাকেননি। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে বলেছেন, 'অন্তরালের সাহিত্যিক'।

সর্বোপরি জগদীশ গুপ্তর মানুষ যদিও বিনষ্ট হয়ে থাকে, শুভ-অশুভ কখনোই বিনষ্ট হয় না, এবং কোনো moral order সূচিত হয় না। জগদীশ গুপ্তের রচনায় জটিল চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না, সবই এক রঙ্গা চরিত্র। 'গৃহদাহ' - এর অচলার মতো তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব নেই, আছে আবর্তন এবং সেইখানেই আছে পাপ-পুন্যের মধ্যে যুগ্মতা, পর্যায় আছে, আছে পরস্পর সাপেক্ষতা- এবং এটাই জগদীশ গুপ্তের কৃত্য। একজন ছোটো গল্পকার হিসেবে জগদীশ প্রাধান্য পেলেও কবিতা রচনাকে যে তিনি বিশেষ কোন একটা সময়ে শখ বা বিলাসিতা

হিসেবে গ্রহণ করেননি-সেকথা প্রমাণ করা। কবিতা রচনায় তার আকস্মিকতার কোনো ভূমিকা ছিল না। কবিতা ও ছোটোগল্প রচনার প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের স্ত্রী চারুবালা দেবী 'জগদীশ গুপ্তের জীবনকথা' প্রবন্ধে একটি স্মৃতি রোমান্থন করেছেন —

> "শুনিয়াছি, ছোটবেলা হইতেই এর কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, গুরুজনেরা দেখে আশ্চর্য। পনের-ষোল বৎসরের ছেলের কবিতা লেখা- ... কুষ্ঠিয়াতে একবার এগজিবিশন হয় ১৩১৪ সাল হবে। ... প্রথমে উত্তরায় দেখা দিতেন, পাটনার চাকরী ছেড়ে দেবার পর খুব লিখতে দেখেছি। মধ্যে মধ্যে প্রবাসীতে লেখা দিয়েছেন, তার পরে ভারতবর্ষে। এরপর কোন নূতন পত্রিকা বেরুলে লেখা চাইলেই দিয়েছেন, কাহাকেও নিরাশ করেন নাই। কল্লোল বেরুলে লেখা দিয়েছেন। কল্লোল অফিস হইতে দিনেশবাবু লেখা চেয়েছেন এবং লেখা দিয়েছেন। দিনেশবাবু লিখতেন- 'গল্প লিখুন, দক্ষিণা পাবেন'। ইনি কবিতাই দিতেন। ঢাকার সোনার বাংলাতেও লেখা দিয়েছেন-কবিতা। আমি যদি বলতাম- গল্প লেখ না কেন, সবাই চাইছে। বলতেন, গল্প আমার আসে না। তারপর কবে থেকে গল্প লেখেন খেয়াল নেই।"[৪]

জগদীশ গুপ্তের কবিতা ও গল্পের মধ্যে যেমন ব্যতিক্রমী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনিই উপন্যাসেও ব্যতিক্রমতা রয়েছে। যা অন্যান্য লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছেন তিনি। তাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'রোমান্থন' উপন্যাসের মুখবন্ধে লিখেছিলেন —

> "শরৎচন্দ্র যখন বঙ্কিমহারা নিষ্প্রভ আকাশে শতচন্দ্র শোভায় উঠলেন বাঙালীর মন-প্রাণ হরণ করে, তখন যে বহু শণিতারা সে নভোমণ্ডল খচিত করে দেখা দিল, জগদীশ তাঁদের অন্যতম। জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র।"[৫]

জগদীশ গুপ্ত কল্লোল-কালিকলমের লেখক ছিলেন, কিন্তু কল্লোল-এর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'belated kallonean' আর অচিন্ত্যকুমারের চোখে মানিক 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। কল্লোলপন্থী, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমবেশি আলোড়িত হলেও এঁরা অন্যের থেকে প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিকভাবেই আলাদা। দুজনের রচনার অন্যতম মুখ্য অন্বিষ্ট হল - উনিরাসক্ত দৃষ্টিতে নরনারীর জীবনে যৌন কামনার তীব্র অভিঘাতকে প্রকাশ করা। জগদীশ যৌন লালসার রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন যা নিষ্ঠুর নিয়তির মতো। মানিক এ জীবন থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন যৌনচেতনার মনস্তত্ত্বের ওপর।

মানিকের দৃষ্টির সঙ্গে জগদীশের এখানেই পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি 'নিয়তি'-চেতনা জগদীশ গুপ্তের মনন ও জগৎকে অনেকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের জীবনের অন্তরালে এক অদৃশ্য ক্রূরশক্তি 'যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমন করিবে।' (মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়) যান্ত্রিক বাস্তবতার বর্ণনা নয় জীবনের গভীরে গিয়ে তার সত্যকে শিল্পীত করতে প্রয়াস পেরেছেন জগদীশ গুপ্ত। এমনই পাঁচটি গল্প আমাদের আলোচ্য 'পয়োমূখম', 'দিবসের শেষে', 'হাড়', 'আঠারো কলার একটি' ও 'চন্দ্র সূর্য যতোদিন'।

লেখক জগদীশ গুপ্ত এ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন-মানব জীবনের নিষ্ঠুরতা, পশুত্ববোধ, শঠতা, আদিম প্রবৃত্তি তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাব নিয়তিবাদ, অসহায়ত্ববোধ, সম্পর্কের রাজনীতি, সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা, মানসিক জটিলতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, বাস্তবতাবোধ, অপরাধবোধ। মানব জীবনের এই দিকগুলিকে তুলে ধরে তার মধ্য দিয়ে এক বাস্তবতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

**সম্পর্কের রাজনীতি** –

পয়োমূখম' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কালি-কলম পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায়। এ গল্পটি বিনোদিনী গল্পসংকলনে স্থান পায়। মানব জীবনের পশুত্ববোধ, শঠতা এ গল্পে স্থান পেয়েছে। শহরের মধ্যবিত্ত মানসিকতা বা আঞ্চলিক জীবনের দৈনন্দিনতা- এর কোনোটাই জগদীশ গুপ্তকে আকর্ষণ করেনি বরং তিনি পৌঁছাতে চেয়েছেন মানব মনের তমসাবৃত গহনে। তাঁর আখ্যানভূবন সমাজ পরিচালিত হয়নি। আমাদের আলোচনার সমর্থনে বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী হাসান লেখকের ভাষায় —

> "কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রথমত হইয়া উঠিলেন, তরতর করিয়া বলিয়া গেলেন তোমাকে বোধ হয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড়ো টানাটানি তাই বুঝি তিনি মেয়ে-জামাই বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন। ...ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেমনি সবেগে অনুসরন করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেলো। ...তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যা কথাগুলির বিনাশ কিন্তু অতো সহজে ঘটিলো না তাদের ধ্বনি, আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধবনি জায়গা প্রতিমুহূর্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণবিবরে আবর্তিত হইতেই লাগিলো।" [৬]

এভাবেই সন্দেহের পথ ধরে দুই মৃতা স্ত্রীর কার্যকারন এর সঙ্গে পিতার এ ঘরে এসে বীনাপাণির প্রতি উদ্বেগ ও ঔষধসেবনের অনুরোধের মধ্যে এক পশুত্ববোধ ও বিকৃত ক্ষুধা ধরা পড়ে ভূতনাথের চোখে। জগদীশ গুপ্তের আখ্যান গদ্যে শব্দ ও বর্ণনার বাহুল্য বিশেষ নেই অনেকটা নির্মেদ।

'বিনোদিনী' গল্প সংকলনে 'পয়োমূখম' গল্পে দেখতে পাই, অর্থ লাভের আশায় পিতা বারবার পুত্রের বিবাহ দিয়ে যৌতুক লাভের পর কৌশলে পুত্রবধূকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের জীবনের কুৎসিত দিকটা তুলে ধরেছেন কৃষ্ণকান্তের মধ্যে। ভূতনাথের প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্ত ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সম্পত্তির লোভে। লেখকের বর্ণনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।

> "এবার পণ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা ... কিছু লোকসান গেলো।"[৭]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের মধ্যে গূঢ় রাজনীতি প্রকাশ পেয়েছে। মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে মূল্যবোধহীন সময় বিকৃত, কুটিল মনস্তত্ত্বকে টেনে বের করেছেন আমাদের জন্য। আমাদের আলোচনার সমর্থনে বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী হাসান আজিজুল হকের 'জগদীশ গুপ্ত: কথাসাহিত্যের বিপরীত স্রোত' প্রবন্ধটির একটি অংশ উল্লেখ করি –

> "সত্যি বলতে কি সমস্ত বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের মতো আর কেউই এতো অবিচ্ছিন্নভাবে এতো রোখের সঙ্গে আগাগোড়া তিক্ত থাকেননি। ...কখনো তা পরিবারের গন্ডির মধ্যে কখনো তা পরিবারের বাইরে আরো অসংখ্য ধরনের লেনদেনের মধ্যে থেকে যায়। আমরা দেখবো জগদীশ গুপ্ত এই সম্পর্কগুলিকে অর্থাৎ সমাজের ভিতরে মানব সম্পর্কগুলিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে তাদের প্রকৃত স্বরূপে দেখাতে চেয়েছিলেন।"[৮]

মানুষের জৈব সত্তা ও ন্যাচারালিজমের ওপর ভিত্তি করে লেখক কৃষ্ণকান্তকে দাঁড় করিয়েছেন 'পয়োমূখম' গল্পে। সন ১২৯৮-এ হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা'-র কথা মনে পড়ে নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে। কিন্তু 'দেনাপাওনা'-র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হলেও কৃষ্ণকান্তের মতো কোনো ছলনার আশ্রয় নিতে হয়নি রায়বাহাদুরকে। প্রায় দুহাজার বছর আগের মহান কূটনীতিজ্ঞ পন্ডিত চানক্যের একটি শ্লোক শব্দ বেছে নিয়েছেন লেখক তাঁর গল্পের নামের জন্য। শ্লোগানটি ছিল এরকম— "পরোক্ষ কার্য-হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ / বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমূখম্।।"

> "The friend who talks sweet in front and does harm in the back. Such friend must be left just like a pot of poison with cream of milk on top."[৯]

আজও এরকমই ভাবে অতি মোলায়েম ছদ্মবেশে আমাদের শিক্ষিত, আধুনিকতার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে সভ্যতার নির্লজ্জ ঘটনা ও কৃষ্ণকান্তের মতো মানুষ। বিকৃত লালসার ফাঁকে বন্দী মানুষদের নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত করেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'পয়োমূখম' -এ।

একজন কবি যেভাবে আধুনিকতাকে দেখেন, একজন শিল্পী সেই আধুনিকতাকে আত্তীকরণ করেন ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে। আমেরিকার দার্শনিক Marshall Howard Berman (১৯৪০-২০১০ প্রফেসর, পলিটিক্যাল ফিলোসফি, দ্য সিটি কলেজ অফ নিউইয়র্ক) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে আধুনিকত্বকে দেখাতে চেয়েছেন। যার মধ্যে ধরা পড়েছে মানুষের সাংস্কৃতির অবভাস। রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক লেখকদের সাহিত্য সম্পর্কে রক্ষণশীল প্রতিপক্ষরা যে অভিযোগ তুলেছিলেন, সে সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন –

> "তাহাদের মতে 'অতি-আধুনিক সাহিত্য অশ্লীল, অপাঠ্য, কুৎসিত রচনা-যাহার উৎপত্তি লেখকদের মানসিক অসুস্থতায় এবং যাহা প্রেরণা ফ্রয়েডীয় মনঃত্ববোধ ও যৌনজিজ্ঞাসা হইতে যাঁহারা ধীর মতি মধ্যস্থ তাহারা

> স্বীকার করিলেন যে 'অতি আধুনিক লেখকদের কেহ কেহ শক্তিমান বটেন, তবে তাহাদের রচনার ভাব প্রায়ই বিদেশের ধার করা এবং তাঁহারা যে সমস্যার উপস্থাপন করিতে চাহেন সে সমস্যা আমাদের দেশে সামাজিক অথবা পারিবারিক পরিবেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই।"[১০]

জগদীশ গুপ্ত গবেষক প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই অভিযোগের উত্তরে লিখেছেন –

> "প্রতি আধুনিক লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ খাটে না। ফ্রয়েডের রচনা জগদীশ গুপ্ত আলো পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একটি মাত্র উপন্যাসে ফ্রয়েডের নামটি উল্লেখ। (দুলালের দোলা) দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বলা যায় যে জগদীশবাবু যে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা করেছেন তারা তাঁর পরিচিতি জন, চোখে রাখা আশেপাশের মানুষ। আধুনিক বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর ক্ষেত্রে নিরর্থক।"[১১]

**নিয়তিবাদ** –

জগদীশ গুপ্ত শুধু আধুনিকতাকে তার গল্পে তুলে ধরেন নি তিনি মানুষের নিয়তিবোধ বা নিয়তি চেতনাকে জাগ্রত করেছেন এরকমই আরেকটি গল্প হল 'দিবসের শেষে'। সেই নিয়তি চেতনা ও ঘটনার আকস্মিকতা কে এবং দুর্ভেয় নিয়তির নির্মমতা ও মানুষের অসহায় তাকে আমরা পাব শিল্পিত বিন্যাসে, বাস্তব ও নৈতিকতার বিতর্ক থেকেই নিয়তি ও অন্ধ কুশক্তির দিকে বাঁক ঘুরে গেছে জগদীশ গুপ্ত পাঠের ক্ষেত্রে।

গল্পের শুরুতেই নিয়তির সীমাহীন পরাক্রমণের জন্য আশ্চর্য, এই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে রাখেনি গল্পকার। রতির একমাত্র ছেলে পাঁচু। 'আধিদৈবিক প্রহরণে'-র বিরুদ্ধে পাঁচুর 'নিয়তির উদ্যত থাকত অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ। নিয়তি বা অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সেইসব সশস্ত্র প্রহরা থাকা সত্ত্বেও পাঁচু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকে বলে, —'মা আজ আমার কুমিরের নেবে'। নারানী চমকে 'সে কী রে?' পাচু পুনরায় স্পষ্টভাবে বলে— 'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।' ঘটনার আকস্মিকতা এবং অনিবার্যতায় গল্পটি পাঁচুর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

গল্পের মধ্যে এইসব চিহ্নে (sing)-র সঙ্গে পাঁচুর ভয়ের একটা স্পাইরাল তৈরি করেন জগদীশ গুপ্ত। কেননা যে কামদা নদীতে কোনদিনই কুমির কেউ দেখেনি সেই কামদা নদীতে কুমিরের আগমন এবং পাঁচুকে নিয়ে যাওয়াকে জগদীশ গুপ্তর নিয়তিবাদকে আশ্রয় দিয়েছেন। এখানেই জগদীশ গুপ্ত সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী মনোভাব ফুটে উঠেছে। ঠিক একইভাবে আমরা দেখি 'হাড়' গল্পেও। সেখানেও এক নিয়তিবাদ কে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। নিয়তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নিয়তির স্বরূপটি কেমন? সাধারণভাবে নিয়তি সম্পর্কিত আলোচনাতে সুকুমারী ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন—

> "কোনো না কোনো চেহারায় নিয়তিবাদ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল যদিও এগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও চোখে পড়ে। প্রাচীন ভারতের এর নাম ছিল নিয়তি, দৈব,ভাগ্য,কাল,বিধি,বিধিলিপি,বিধান। প্রাচীন সভ্যতা গুলিতে ভাগ্যের যে লক্ষণগুলি আছে তার থেকে একে তারা দৈব, ভাগ্য, অচিন্ত্য, অদৃষ্ট যা-ই বলুক না কেন, একে দেখা হত যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক শক্তি হিসেবে। বিশ্বে সক্রিয় একটি মহাজাগতিক শক্তি মানবিক অভিজ্ঞতায় যার প্রকাশ এবং সাধারণত বা দুর্বোধ্য অনিয়ন্ত্রনীয়, আমোদ, নিযুক্তিক এবং হেতু রহিত অর্থাৎ কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে জড়িত নয়।"[১২]

তাঁর মতে—

> "হয়তো ভারতীয় নির্বাতির যথার্থ প্রতিরূপ হল গ্রীক 'নেমেসিস', যার সম্বন্ধে কিছুই পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রতিহিংসা যার মুখ্য চরিত্র। যে নেমেসিসের উপর জেউস রূঢ়ভাবে বলাৎকার করেন তার কাহিনী বিবৃত আছে। এই দেবীটির নামেই নিহিত, যে ইনি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন।"[১৩]

'হাড়' গল্পে দেখা যায় — রতিকে পাড়ার সবাই ডাইনি বলে জানে, তাই তার থেকে সবাই দূরে সরে থাকতে চায় কারণ পাড়ার লোকের বিশ্বাস বলে নাকি তাই ঘটে। তাই দেখা যায় একদিন সনাতন এর সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধে সেই সনাতন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এবং রতি যে ডাইনি তা কিছুই মানে না। তাই সে রতি কে যা নয় তাই বলে, এবং রতি সনাতনের এই 'ডাইনি' অপবাদ অনেক কাল সহ্য করে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছে। 'হাড়ে তেমন জোর নাই : মুখেও দন্ত নাই'- এমন এক অক্ষম বৃদ্ধা রসির সক্ষম সনাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পদ্ধতিটি অন্যরকম। তাই

সনাতন মাছ ধরতে যাবার সময় রতিকে যা তা বললে সে অপমান সহ্য করতে না পেরে রতি সনাতন কে অভিশাপ দিয়েছে– 'ঐ মাছই যেন আজি তোকে মারে। কিন্তু শেষে দেখা যায় যে সনাতনের মাছের হাড় গলায় লেগে তার আকস্মিক মৃত্যু রসিকে আবার ডাইনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিল। এইভাবে গোটা গল্পে রসি অলৌকিক -অন্ধকারাচ্ছন্ন 'ডাইনি' পরিচয় থেকে বাইরে আসতে চায়, মথুরের মা হতে চায়, কিন্তু অমোঘ নিয়তি মানির গর্ভপাত ঘটিয়ে, সনাতনের মৃত্যু তার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। সনাতনের অত্যাচার বা অন্যায় আচরণের বিপরীতে যে আত্মধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল তাই ক্রিয়ারূপ পেয়েছে।

শেষে হাড় আটকে সনাতনের মৃত্যু জগদীশ গুপ্ত অসাধারণত ভাবে নিয়তিবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে জগদীশ গুপ্তের শিল্পিত স্বভাব এর ব্যতিক্রমীতা লক্ষ্য করা যায়—

> **"**জগদীশ গুপ্ত মানুষের জীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেননি। মানুষের জীবনব্যাপী প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায় বলে তাঁর বিশ্বাস। এই ব্যর্থতার অন্তরালে তিনি অনুভব করেছেন এক অন্ধ নির্মম শক্তিকে।"[১৪]

গল্পের সমাপ্তিতে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে 'ঘটনার আকস্মিকতা' আছে সেই আকস্মিকতা কে জগদীশ গুপ্ত গল্পের নান্দনিকতার বিন্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট আখ্যানকার, প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য –

> "এটা করুণ রসের গম কিনা জানি না, এতে ভারী একটা রুক্ষতা আছে, ...। অত্যন্ত প্রবল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের বুদ্ধির সার তাতে নেই। ... গ্রীক অদৃষ্টবাদ যেমন মানুষের কর্মে অন্তরনিবিষ্ট, জগদীশ গুপ্তের রচনায় তা নয়। তবে কি জগদীশ গুপ্তের রচনা মানব সত্য আদৌও নেই? কথাটার জবাব দিতে গেলে বলতে হয় মিথ্যার মতো সত্যও অমোঘভাবে স্থির ও অবধারিত না।"[১৫]

অনিলবরণ রায় 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' নামে বিচিত্রা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে গ্রীষ্মের নাটকের নিয়তির সঙ্গে তুলনা করেছেন জগদীশ গুপ্তের গল্পের নিয়তির। তাই মোহিতলাল মজুমদার বলেন -

> **"**মানুষের জীবনের একটা অতিশয় দয়াহীন ও দূর্জ্ঞেয়-নির্ধাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে...। তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়- যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি-প্রাকৃত রূপ।"[১৬]

যার প্রতিফলন ঘটে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। সেটাই আলাদা করে দেয় গ্রিক নিয়তি ও আধুনিক নিয়তিকে আর এখানেই জগদীশ গুপ্তের ব্যতিক্রমীতা লক্ষিত হয়।

**সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা –**

জগদীশ গুপ্ত জনসমাজের ভয়াবহ ভাঙ্গন এর ছবি এঁকেছেন, তাঁর ব্যক্তিনির্ভর দৃষ্টিকে এমনভাবে দাঁড় করিয়েছেন এই সর্বনাশের প্রক্রিয়ায় যে তার তাৎপর্য এখনও অটুট। তাঁর ছোটগল্পের প্রধান অবলম্বন, নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণী। তবে তাঁর গল্পে শুধু পুরুষ মনস্তত্ত্বই নয় নারী মনস্তত্ত্ব ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের রাজনীতি সম্পর্কের বহুমাত্রিকতাও তার গল্পে ফুটে উঠেছে। এরকমই গল্প হল 'আঠারো কলার একটি' ও 'চন্দ্র-সূর্য-যতদিন' গল্প।

'আঠারো কলার একটি' গল্পটিকে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও বিষয়গত দিক থেকে তা মোটেই সাধারণ নয় এখানে দাম্পত্য জীবনের অবসাদ। একঘেয়েমি ক্লান্তি থেকে মুক্তির ইচ্ছা এর মূল বিষয়, একে কেন্দ্র করেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের রাজনীতির রূপ প্রকাশ পেয়েছে শুধু রাজনীতিই নয় সম্পর্কের বহু কৌণিকতাও লেখক জগদীশ গুপ্ত এ গল্প গুলির মধ্যে তুলে ধরেছেন। অতি সাধারণ ঘরের রূপ গুন সম্পন্ন ছাব্বিশ বছরের যুবক বেনুকর বিয়ে করেছে ঊনিশ বছরের জানকিকে। তাদের এই চার বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে দেখা দিয়েছে একঘেঁয়েমি। লেখকের ভাষায় —

> "সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে বেনুকরের সম্ভোগের ধারণায় একটা পরিছন্নতা আর আকাঙ্ক্ষার একটা স্থৈর্য এসেছে।"[১৭]

তাই বেনুকর জানকীর কাছে পেতে চায় নতুন কিছু। বিবাহের চার বছরের এই দাম্পত্য জীবনে তাঁর ক্লান্তি, অবসাদ, একঘেয়েমির জন্য তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে তাই তার মনে হয়েছে– "তৃষ্ণা যেন নিঃশেষ হয়ে মিটছে না — কে যেন দ্রাক্ষারসে জল ঢেলে দিয়েছে।" বেনুকরের মনে হয়েছে তার স্ত্রী কিছুই ছলা-কলা জানেনা। কোন মনোরঞ্জন করতে

পারেনা। তাই বেনুকর বলেও ফেলে একদিন– 'মেয়ে মানুষের আঠারো কলা সত্যি নাকি?' জানকি জানায়- 'সত্যি নয়। কলা আঠারো তো নাই, তার ঢের বেশি কেউ বলে ছত্রিশ, কেউ বলে চুয়ান্ন!' গল্পের এই অংশগুলির মধ্যে মানব-মনের জটিল গতিবিধিকে যেমন দেখার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনি আপাত সুখী দম্পতির গভীর রহস্যকেও অনুসন্ধান করা হয়েছে। গল্পের এই অংশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কতগুলি দিক লক্ষ্য করা হয়েছে।

**এক :** দাম্পত্য জীবনের একঘেঁয়েমি যখন বেনুকরকে গ্রাস করেছে, তাই সে দাম্পত্য জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

**দুই :** দাম্পত্য জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে বেনুকর যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তা আসলে মনের সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ। নারী-পুরুষের এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য মধ্যে আমরা পাই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ছোঁয়া।

> "প্রাক্-চেতন মনের (pre-conscious) গভীরে আরও একটি মন আছে, যে মনে প্রবৃত্তির ইচ্ছার বাস, ভালোবাসা-সৃষ্টি-নির্মাণ, ঘৃণা-ধ্বংস-যুদ্ধের ইচ্ছার সহবাস এই গভীর গহন অবচেতন মনেই অবদমিত ইচ্ছাদের বাস।"[১৮]

**তিন :** আপাত সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রতি বেনুকরের যে ক্ষোভ তা গল্পকার সুন্দরভাবে এ গল্পে দেখিয়েছেন। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**চার :** গল্পে জানকির রূপ যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি গুণেরও প্রশংসা করা হয়েছে। দাম্পত্যের প্রতি বিষাদ; সম্পর্কের প্রতি অবসাদ, আকর্ষণহীনতা বেনুকরকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে তা থেকে যেনতেন প্রকারে মুক্তি পেতে সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

**পাঁচ :** নারী মনের জটিল-কুটিল দ্বন্দ্বপ্রকাশ, নারী মনের কুটিল স্বার্থপরতার কথা। জগদীশ গুপ্ত তাঁর আখ্যান বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন, বেনুকরের আঠারো কলা দেখতে চাওয়ার মধ্যেও সম্পর্কের এক রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

ঠিক তেমনি আরেকটি গল্প হল 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পটি। এ গল্পকে ঘিরে লেখক মানবমনের সম্পর্কের টানাপোড়ন লোভ-লালসা, যৌন প্রবৃত্তিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জগদীশ গুপ্ত তার গল্পে মানস লোকের অন্তরবয়নের দিকে দিকপাত করেছেন। এই যে inner man বা মানুষ লোকের অর্ন্তবয়নের দিকে দৃষ্টিপাত তা তার ছোটগল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দুলালের দোলা (১৯৩১) উপন্যাসের ভূমিকায় জগদীশ গুপ্ত যা লিখেছিলেন, তা তাঁর গল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য ও স্মরণীয় –

> "ইহাতে প্লট নাই- আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরি আমার উদ্দেশ্য নয়।। ... উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন, তবে আমি বিস্মিত হইবো না।"[১৯]

জগদীশ গুপ্তের এক তিক্ত, রুক্ষ, নৈরাশ্যবাদী ও অস্বস্তিবোধের গল্প 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন'। এখানে পাপ-পুন্যি বলতে কিছু নেই, শরীরের সুখই সুখ মনের সুখ ও শরীরের সুখ দিয়েই আসে, এই রকম এক জীবনদর্শন প্রতিভাসিত হয়েছে। লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন, পুরুষের কাম কিভাবে অপরকে মানসিক বৈকল্যের নৈকট্যের কাছে নিয়ে যায়, আধিপত্যবাদী পরম্পরার ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখোমুখি পাঠককে নিয়ে যায়, সেরকম গল্প 'চন্দ্র-সূর্য-যতোদিন', কিভাবে সম্পত্তির লোভ সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করে তাই তিনি দেখিয়েছেন।

জগদীশ গুপ্তের মতই আরেকজন উপন্যাসিক হলেন লরেন্স। লরেন্স-এর উপন্যাসে বাস্তব পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র -সবই আমরা পাই। তবু তার পরিবেশ - চিত্রণ বাস্তবতার লক্ষ্য প্রায়ই অতিক্রম করে ও প্রতীকী হয়ে ওঠে। গল্পাংশ আগ্রহ জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা লরেন্সও সব সময়ে করেন না। তার অনেক উপন্যাসই আইডিয়া নির্ভর। সেই আইডিয়া-র মূল কথাই হল নর-নারীর বৃত্ত টানটান সম্পর্ক। সেটাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে চান। হার্বার্ট রীড একটি চিঠিতে কথাসাহিত্য রূপ বিষয়ে লিখেছিলেন–

> "It is the purity of vision that matters, and not the shape or location of the thing seen,"[২০]

এই দিকেই দৃষ্টি ছিল লরেন্স-এর, জগদীশ গুপ্তেরও। তবে জগদীশ গুপ্তের লেখায় গ্রাম –সমাজ, গ্রাম নগর সম্পর্ক, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী বিন্যাসের দিক যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় বাস্তবতার চালচিত্র থাকে অনেক বেশি। স্ত্রী পুত্র সংসারে

কিছুরই অভাব ছিল না তার, কিন্তু সম্পত্তির লোভে তার দ্বিতীয় বিবাহ প্রথমা পত্নীর মধ্যে অর্থাৎ ক্ষণপ্রভার মনের ভিতরে একটি ঘৃণাবোধের জন্ম দেয়। তাই গল্পকার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন —

> "যবনিকার অন্তরালে চির অন্ধকার পরচিত্তে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই- দীনতারণও না।"[২১]

দীনতারণের মত চরিত্রের মানুষগুলোর কাছে মেয়েমানুষ শরীর বয়স, রূপের জৌলুস বেশি আকর্ষণ পায়। তাই দীনতারণ অনায়াসে মানুষের তৈরি হুজুগের প্রবাদে বিশ্বাস করে ফেলে— 'মেয়েমানুষ কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।' জগদীশ গুপ্ত কেন দেহবাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুঃখবাদ, নিয়তিবাদ এবং অন্ধবিশ্বাসের জগতে ফিরে গিয়েছিলেন তার কারণটি খোঁজা দরকার কল্লোল গোষ্ঠী বোধ হয় দেহবাদের দীক্ষা নিয়েছিল মোহিতলাল মজুমদারের কাছে, তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন -

> "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম, এককথায়, তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলাম।"[২২]

আসলে নারী হৃদয়ের অনুভূতিগুলি বড়ই অদ্ভুত হয়। সম্পত্তির লোভের তাড়নায় দীনতারণের বিবাহের সব নৃত্যান্ত জানা সত্ত্বেও ক্ষণপ্রভার প্রশ্নচিহ্ন হয় নিজেকে নিয়েই ও তার যৌবনকে নিয়েই নিজস্ব অবস্থানকে বুঝতে চেয়েছে সামাজিক পরিসরে ও যৌন আকাঙ্ক্ষার আবেদনে -

> **"**ক্ষণপ্রভা মনে মনে স্বামীর দিকে চায় —
> আবার মনে মনে নিজের দিকে চায় –
> মনে মনে যাচাই করে তার বয়স আছে কি গেছে ... একবার মনে হয়, গেছে; একবার মনে হয়, যেন আছে –"[২৩]

ক্ষণপ্রভার মতো এমন নির্মম অথচ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মানবহৃদয়ের গোপনতম স্বরূপ উদঘাটনের উদাহরণ এর আগে পাওয়া যায়নি। তিনি অসহায় নারীর জীবন চক্র হিসাবে ক্ষনপ্রভার কাহিনীকে তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকে সত্যিই, কিন্তু এরকম যৌনলালসা ক্ষণপ্রভা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তার নগ্ন দেহে, ছেলেটিকে বুকে নিয়ে উদমাদ অবস্থায় পাওয়া গেল রাস্তা থেকে। প্রেম মমত্বহীন দেহগত সম্পর্ক, যেকোনো সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ মানুষের অস্তিত্বের সবটুকু নাড়িয়ে দিতে পারে তাই প্রমাণ করে দিলেন জগদীশ গুপ্ত ক্ষণপ্রভা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে ক্ষণপ্রভা সাহচর্য পাওয়ার জন্য তার শিশুটিকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আজ সেই ক্ষণপ্রভার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে যখন বিশুদ্ধতার প্লাবন বয়ে চলেছে তার সেই স্বামী তার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাম্পত্য জীবনের এই দেহ ও বিষয় সর্বস্বতার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পে-

> "দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার; কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। অধিকাংশ লোকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই, তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না।"[২৪]

তবে নারী হৃদয়ের জটিলতা, টানাপোড়েন, ও ধর্ম সংকট সবটা খুজে পেয়েছি ক্ষণপ্রভার শাশুড়ির মননে। নিজের আত্মগ্লানি কাটাতে সুভদ্রা ক্ষণপ্রভাকে দীনতারণের কাছে রাত্রি কাটাতে পাঠায় এটাই গল্পের মূল turning point পরে ক্ষণপ্রভা কে দেখা যায় রাস্তা থেকে তাকে চেনা একজন ধরে এনেছে তাদের বাড়িতে। এখানে শেষ কথাটি যেনো নারী অন্তর্বেদনার সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার চরিত্রের শেষ গন্তব্য চিহ্নিত করে দেন- 'সম্পূর্ণ উম্মাদ'। কিন্তু ছেলেটি বুকেই আছে। বিদ্যমান বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত এক অনন্য শিল্পী।

জগদীশ গুপ্তের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে এক দুঃসাহসী ভাবনার পরিচয় রয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হত না। তবে গল্পরসের মধ্যে ছিল সমকালীন লেখকদের থেকে আপেক্ষিক রুক্ষতা, যার জন্য পাঠকের কাছে তাসবসময় আকর্ষণীয় ছিল না। ভূদেব চৌধুরী জগদীশ গুপ্তের গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাংলা গদ্যগয়ে জীবন-দৃষ্টি ও রূপশৈলীর সৃজনক্ষেত্রে জন্মদীশ গুপ্ত দ্বিতীয়রহিত, অনেকটা মধুসূদনের মতই যদিও মধুসূদনের অনুরূপ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য তাঁর পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল।' তাঁর গল্পে

প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর রূপ অনুপস্থিত। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী গ্রামের নীচুতলার মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব। শরৎচন্দ্রের বা বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসের নীচুতলার মানুষের সঙ্গে তাদের মিল নেই। তিনি দেখিয়েছেন দেহাশ্রিত যৌনচেতনার রূপ। যৌবনের রোমান্টিক স্বপ্ন বা বিহ্বল ভাববিলাসে তাঁর আস্থা নেই। শরৎচন্দ্রীয় আবেগ ও কল্লোলীয় ভাবুকতা — এই দুই রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে তিনি পরিহার করেছেন। তাই সবদিক থেকে আধুনিক কথাসাহিত্যিক ও ব্যতিক্রমী লেখক হিসেবে জগদীশ গুপ্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**তথ্যসূত্র :**

১. গুপ্ত, জগদীশ, 'আঠারো কলার একটি', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা.), জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা ১৯৯৬,পৃ. ২০৫

২. গুপ্ত, জগদীশ, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ১

৩. তদেব, পৃ. ২১

৪. তদেব, পৃ. ৮৮

৫. তদেব, পৃ. ১৩২

৬. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদনা), পুস্তক বিপণি, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ২২-২৩

৭. তদেব, পৃ. ১২

৮. ভট্টাচার্য, দেবশ্রী; "পয়োমূখম্'-এর আরশি ও বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানুষ', উত্তম পুরকাইত (সম্পা.) উদাহরণ প্রকাশন, জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৪, পৃ. ৪১৪

৯. তদেব, পৃ. ৪১৫

১০. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (চতুর্থ সংস্করণ),' সুবীর কুমার মিত্র (প্রকাশিত), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩, অষ্টম মুদ্রণ আগষ্ট ২০১৪, পৃ. ২৭৫

১১. গুপ্ত, জগদীশ, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ৯৯

১২. মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার, 'কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটোগল্পের একশ বছর : ১৮৯১-১৯৯০, 'দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৩৮

১৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩২

১৪. ঘোষ, অর্ণব, 'জগদীশ গুপ্তের গল্প 'হাড়', উত্তম পুরকাইত (সম্পা.), উজাগর প্রকাশন, জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৪,পৃ. ৪৫৭

১৫. মন্ডল, বরেন্দু, 'জগদীশ গুপ্তের গল্পে আধুনিকতা', উত্তম পুরকাইত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

১৬. পাল, অনল, 'নিবার্য অনিশ্চয়তা: জগদীশ গুপ্তর আখ্যান প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব, ' ঐ, পৃ. ৩১৬

১৭. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদনা), পুস্তক বিপণি, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ১৮০

১৮. মন্ডল, জগদীন্দ্র, 'ফ্রয়েড : স্বপ্ন ও প্রাসঙ্গিকচর্চা', সুবল সামন্ত (সম্পা.) এবং মুশয়েরা (সিগমুন্ড ফ্রয়েড বিশেষ সংখ্যা-পুষ্পা মিশ্র), জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃ. ১৯৪-৯৫

১৯. গুপ্ত, জগদীশ, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ৬৬

২০. তদেব, পৃ. ১৯৭

২১. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্ত শ্রেষ্ঠ গল্প', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৭

২২. গুপ্ত, জগদীশ, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, পৃ. ২

২৩. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্ত শ্রেষ্ঠ গল্প', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৮

২৪. রায়, বিকাশ, 'গল্পকার জগদীশ গুপ্ত : শিল্পিত স্বভাবে ব্যতিক্রমী', উত্তম পুরকাইত (সম্পা.), উজাগর প্রকাশন, জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৪, পৃ. ৪০০

**গ্রন্থঋণ :**

**১.** গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প,' সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা.), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৫০

২. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্ত:জীবন ও সাহিত্য', সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯৩

৩. গুপ্ত, জগদীশ, 'জগদীশ গুপ্ত শ্রেষ্ঠ গল্প', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, পুণমুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০১

৪. সেন, সুকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ সংস্করণ), সুবীর কুমার মিত্র (প্রকা.), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪

৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণ 'কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটোগল্পের একশ বছর : ১৮৯১ - ১৯৯০', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ - ১৪০২

৬. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা

**সহায়ক পত্র-পত্রিকাপঞ্জি :**

১. ভাদুড়ী সতীনাথ (প্রকা.) 'জলার্ক : জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা', সতীনাথ ভাদুড়ী অনুপূরক ক্রোড়পত্রসহ, ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম সংকলন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৮ চৈত্র ১৩৮৮

২. চক্রবর্তী, আনন্দ (প্রকা.), 'মুরলীধর বসুকে লেখা চিঠি, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫